প্রাইমারী স্তরে বিজ্ঞান ও কৃষি-শিক্ষা

মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম খান

বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের একটা স্বাভাবিক ভীতি রয়েছে। তাদের ধারণা যে শুধুমাত্র মেধাবী ছাত্ররাই বিজ্ঞান পড়ার উপযুক্ত। এ ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে হবে। আমরা যে যুগে বাস করি, সে যুগের কর্ণধার বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শুধু গবেষণাগারের বিষয় নয়, এর প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে। তাই শৈশবকাল হতে ছাত্রদের বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় ঘটাতে হবে। তবে প্রথমেই বৈজ্ঞানিক জটিল তথ্য পরিবেশনের পরিবর্তে আমাদের চিরপরিচিত ও পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক রহস্য রয়েছে তাই তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। মানুষের দেহই একটি বিশাল বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। তাই আমাদের শরীর, পরিচিত বৃক্ষরাজি, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু, মাছ, মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রয়েছে তাই আকর্ষণীয়ভাবে ছাত্রদের কাছে উদ্ঘাটিত করতে হবে। হাতে-কলমে শিখাতে হবে তাদের সব কিছু। খেলনা, সাধারণ সরঞ্জামাদি, প্রদর্শনী, প্রভৃতির সাহায্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

বিজ্ঞানের সাথে গণিতের সম্পর্ক গভীর। এমন কি গণিত ছাড়া বিজ্ঞানের কোন শাখাই অগ্রসর হতে পারে না। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে শৈশব হতে গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সাধারণত গণিতের শিক্ষকরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কোর্স সমাপ্ত করে থাকেন। সাধারণ মেধার ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারলো কিনা সে বিষয় তারা তেমন নজর রাখেন না। ছাত্রেরাও প্রশ্ন করতে ভয় পায়। অনেক সময় লজ্জায়ও প্রশ্ন করে না। ফলে অংকের প্রতি বাল্যকালেই তাদের মনে ভীতির সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে অংক এমন একটি বিষয় যার কোনটাই বাদ দেয়া যায় না। সাধারণ যোগ থেকে শুরু করে সব কিছুই প্রয়োজন হয়। তাই অংকের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম যদি কারও বোধগম্য না হয়, সে পরবর্তী কোন কিছুই সঠিকভাবে বুঝবে না। এজন্যই অংক শিক্ষকদের সবচেয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণ একটি যোগ সম্পর্কেও যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ছাত্রের সামান্যতম সংশয় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বিয়োগ শেখানো উচিত হবে না। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ছাত্রকে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রয়োজন হলে একটি নিয়ম বিশ বার বুঝাতে হবে। তদুপরি প্রতিটি ছাত্রের অংকের খাতা আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হবে। তাড়াহুড়া করে কোর্স সমাপ্ত করার কোন প্রয়োজন নেই।

কোন শিক্ষক যদি সারা বছর বসে একটি শ্রেণীর সব কটি ছাত্রছাত্রীকে যোগ-বিয়োগ-পূরণ-ভাগ সঠিকভাবে শেখাতে পারেন, তবে তাই যথেষ্ট।

উন্নত দেশে অংক শেখানোর নানা রকম কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভব হলে সে সব কৌশলের সাথে আমাদের ছাত্রদেরও পরিচয় ঘটাতে হবে। মোটকথা, বিজ্ঞান ও অংকের উপর সবচেয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ছাত্ররা যদি একবার এ বিষয় দুটি রপ্ত করতে পারে, তখন তারা নিজেরাই অধিক জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং তাদের সুপ্ত সৃজনী শক্তি একদিন বিকশিত হবে। অবশ্য এ দুটি বিষয়ের শিক্ষকদের বিশেষ ট্রেনিং-এরও প্রয়োজন রয়েছে। তদুপরি আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অত্যন্ত গরীব। তাদের অধিকাংশের গৃহে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই, শিক্ষক রাখার সঙ্গতিও নেই। অনেক পিতামাতা তেল খরচ করে রাত জেগে পড়াশুনাকে বাহুল্য বলে মনে করে। তাই নিম্ন প্রাইমারী পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের অধিকাংশ অধ্যয়ন শ্রেণী কক্ষে শেষ করতে পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। একই সাথে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যেসব বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দ সাধারণভাবে পরিচিত, তাকে জোর করে বাংলা করার কোন প্রয়োজন নেই। উদযান, অম্লযান প্রভৃতি শব্দের চেয়ে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি ইংরেজী আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও পরিচিত। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হলে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

উচ্চ প্রাইমারী অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণী হতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এমন কি প্রয়োজন হলে এর কোর্স সংক্ষিপ্ত করে কৃষি স্বাস্থ্যবিধি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অবশ্যই প্রবর্তন করতে হবে। কৃষি আমাদের প্রধান উপজীবিকা এবং ভবিষ্যতেও এর গুরুত্ব লাঘব হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এমন কি আমাদের অধিকাংশ শিল্পও কৃষিভিত্তিক। তদুপরি যে হারে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত না হলে কয়েক কোটি লোককে অনাহারে দিন যাপন করতে হবে। তাই আমাদের কৃষির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক। আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুসৃত কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট জমি নিয়ে অগণিত মানুষের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যাবে না। তাই কৃষি ক্ষেত্রে আজ প্রয়োজন শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনসম্পদের। বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা চালু করে দেশের প্রতিটি কিশোরকে যদি বাধ্যতামূলকভাবে উন্নত কৃষিবিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া যায় তাহলে আগামী দশ বছরে দেশের চেহারা যে পাল্টে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাইমারী পর্যায়ের কৃষি বিষয়ক পুস্তক হতে হবে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবভিত্তিক। পাউন্ড, লিটার, মিটার, কিলোগ্রাম, গ্রাম, হেক্টর প্রভৃতি বিদেশী ও অপরিচিত শব্দের পরিবর্তে সের, ছটাক, বিঘা, কাঠা, হাত, ফুট, গজ, ইঞ্চি, তোলা, আঙ্গুল, বিঘত প্রভৃতি দেশীয় ও প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তদুপরি একজন মোটামুটি আদর্শ কৃষকের যেসব বিষয় জানা অপরিহার্য তাই প্রাইমারী পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা, আধুনিক চাষ পদ্ধতি, বিভিন্ন ফসল বোনার সময়, সেচ ব্যবস্থা, সার তৈরি ও প্রয়োগ, ফসল কাটা, ওষুধ ব্যবহার, নানা ধরনের পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার, বীজ সংরক্ষণ ও বীজ তৈরি। ফসল মাড়াই ও সংরক্ষণ, বিভিন্ন শস্য, ফল, শাকসবজি ও তরিতরকারী উৎপাদনের সময়, পদ্ধতি এবং গুণাগুণ, বিভিন্ন শস্য, ফল ও তরিতরকারীর অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দেয়া অংশের গুণাগুণ বিচার ও ব্যবহার, কুটির শিল্প প্রসারের উপায় ও প্রয়োজনীয়তা, বাগান তৈরি, বিশ্ব বাজারে আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা ইত্যাদি। এর সাথে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ও বিভিন্ন গৃহপালিত পশু পালনকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এসব বিষয়ের উপর প্রতিটি শ্রেণীর জন্যে আলাদা পুস্তক রচনা না করে তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য একখানা পুস্তক প্রণয়ন করাই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে সমগ্র বিষয়ের উপর একটি সুসংহত ধারণা সৃষ্টি হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ের জন্য গাইড বুক হিসাবেও সকলে ব্যবহার করতে পারবে। সমবায় ও যৌথ কৃষি ব্যবস্থা প্রচলনের উপকারিতাও পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। পরিবার পরিকল্পনাকে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত না করলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মারাত্মক ফলাফল ও ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি অধ্যায় সংযোজন করা উচিত। শত চেষ্টা করলেও আমাদের দেশে ষোল আনা যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা চালু করা আপাতত সম্ভব নয় বা যুক্তিযুক্তও নয়। তাই আমাদের প্রচলিত কৃষি প্রণালী ও কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়নের উপরই গুরুত্ব দিতে হবে। লাঙ্গল পরিহার না করে কিভাবে উন্নত লাঙ্গল ব্যবহার করে আমরা খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে পারি সে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

শুধু পুঁথিগত আলোচনায় ছাত্রেরা তেমন কিছুই শিখতে পারবে না। অনেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য মুখস্ত করে পরে সব ভুলে যাবে। তাই কৃষি শিক্ষাকে উদ্দেশ্যমূলক এবং বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকরী করতে হলে ছাত্রদের সব কিছু হাতে-কলমে শেখাতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন হবে প্রতিটি স্কুলের জন্য প্রদর্শনী খামারের। কিন্তু আলাদাভাবে প্রতিটি স্কুলের জন্য প্রদর্শনী মাঠ তৈরি বা ক্রয় করা ব্যয়বহুল হবে। এ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্কুলের নিকটবর্তী এক একর জমি নগদ টাকায় লীজ নেয়া যেতে পারে। এ জমিতে একটি প্রদর্শনীমূলক খামার ছাত্র, শিক্ষক এবং স্থানীয় কৃষি কর্মচারীদের সহায়তায় গড়ে তুলতে হবে। জমি চাষের জন্য স্থানীয়ভাবে ভাড়ায় গরু-মহিষও সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে নিজ হাতে সমগ্র জমি ছাত্রেরা কর্ষণ না করে নগদ অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় কৃষকদের এ কাজে নিযুক্ত করা যাবে। ফসল কাটা, নিরান এবং মাড়াইয়ের কাজেও মজুরদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে বীজ বপন, সার প্রয়োগ, ওষুধ ছিটানো, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত প্রভৃতি কাজ ছাত্রদের নিজ হাতে করতে হবে। অধিকন্তু একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদন করতে হবে। এ কার্য তদারক ও সময় মত পরামর্শ দেয়ার জন্য কৃষি কর্মচারীদের এগিয়ে আসতে হবে। তবে পৃথকভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কৃষি শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়তো সম্ভবপর হবে না। এ সমস্যা সমাধানকল্পে প্রাইমারী শিক্ষকদের মধ্য হতে বাছাই করে একদল শিক্ষককে ট্রেনিং দিয়ে আনতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে তাদের বিশেষ ট্রেনিংয়ের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ কেন্দ্রেও প্রেরণ করতে হবে।

এভাবে শিক্ষক ও ছাত্রদের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলের সাথে একটি আদর্শ কৃষি খামার গড়ে উঠলে স্থানীয় কৃষকরাও উপকৃত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ খামারের জন্য সরকারী অনুদানের হয়তো প্রয়োজন হবে। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে প্রতিটি খামার লাভজনক বলে চিহ্নিত হতে পারবে। এ খামার হতে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসলের বিক্রি মূল্য হতে জমির মূল্য এবং মজুরদের মজুরী দিয়ে যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে তার এক ভাগ স্কুল ফান্ডে জমা দিয়ে বাকি দু ভাগ অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা সমান হারে ভাগ করে নেবে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রতিটি স্কুলের একটি নিজস্ব তহবিল গড়ে উঠবে এবং ছাত্ররাও উৎসাহিত হবে। স্কুলের তহবিল হতে প্রয়োজন মত কৃষি সরঞ্জামাদি ক্রয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে একটি ছোট মাঠে সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা হয়তো সম্ভবপর হবে না। তাই কমপক্ষে পাঁচ মাইল এলাকাভুক্ত সমস্ত প্রাইমারী স্কুলগুলোকে নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্লক গঠন করা যেতে পারে। এ ব্লকভুক্ত প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলে এক একটি প্রধান ফসলের খামার থাকবে এবং এ খামার অন্যান্য স্কুলের ছাত্ররা পরিদর্শন এবং প্রয়োজনবোধে অংশগ্রহণ করবে। একই সাথে গোবর ও অন্যান্য জৈব এবং নীল সার তৈরির ব্যবস্থাও করতে হবে। আমাদের দেশের কৃষকরা বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে নানা রকম জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় জৈব ও নীল সারের উপর গুরুত্ব আরোপ। আমাদের দেশে জৈব সার তৈরি খুবই সোজা। গোবর, আবর্জনা, লতাপাতা, ঘাস, নাড়া, খড় প্রভৃতি পচিয়ে অনায়াসে প্রচুর সার তৈরি করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন শুধু সামান্য উৎসাহ এবং শিক্ষাদান।

পল্লী অঞ্চলে সামান্য অর্থ ব্যয় করলেই প্রচুর গোবর ক্রয় করা যায়। এর সাথে আবর্জনা ও লতাপাতা প্রভৃতি মিশিয়ে যে সার তৈরি হবে তা বিক্রি করেও লাভবান হওয়া যাবে। একই সাথে বিভিন্ন সেচ প্রণালী, ফসল সংরক্ষণ, সার প্রয়োগ, ওষুধ ব্যবহার, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, মৃত্তিকা পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ও ছাত্রদের হাতে-কলমে শিখাতে হবে। কৃষির সাথে হাঁস-মুরগী ও গৃহপালিত পশু পালন এবং মৎস্য চাষের উপরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তবে প্রতিটি স্কুলের পক্ষে এর জন্য আলাদা খামার তৈরি করা সম্ভবপর নয়। তাই প্রতিটি ব্লকের জন্য কমপক্ষে একটি মৎস্য উন্নয়ন খামার, হাঁস-মুরগীর খামার এবং পশু খামার স্থাপন করা অপরিহার্য। এ সমস্ত খামার আকারে বৃহৎ হবার কোন প্রয়োজন নেই। এর আসল উদ্দেশ্য হবে ছাত্রদের হাতে-কলমে শিক্ষা দান এবং স্থানীয় লোকদের উৎসাহ প্রদান।